কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংগঠনগত সমস্যা

১৯৫৯ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে তদানীন্তন কংগ্রেসি সরকার খাদ্যের দাবিতে মিছিলে অংশগ্রহণকারী ক্ষুধার্ত, হতদরিদ্র কৃষক, খেতমজুরের উপর নৃশংস অত্যাচার নামিয়ে আনে এবং নির্বিচারে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কে কে এম এফের দশম সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে কমরেড শিবদাস ঘোষ সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। দেশের কৃষক সমাজ তথা আপামর জনসাধারণের দুর্দশার প্রকৃত স্বরূপ কী, তার কারণ কী, রাষ্ট্রশক্তি কেন তাদের উপর এই নৃশংস আক্রমণ নামিয়ে আনছে, এবং এই শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে তাদের মুক্তির প্রকৃত রাস্তা কী, সে বিষয়ে এই আলোচনায় তিনি দিকনির্দেশ করেছেন। প্রসঙ্গত, কৃষকদের বিপ্লবী সংগঠন কে কে এম এফ-এর সাংগঠনিক সমস্যাগুলি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং নেতা ও কর্মীদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্য কী কী করণীয়, তাও দেখিয়েছেন।*

প্রথমেই আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টা তুলে ধরতে চাই, সেটা হল — আপনাদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলো, যেগুলো কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের এই সম্মেলনের প্রস্তাবে গৃহীত হয়েছে, সেই সমস্যাগুলো ছাড়াও আজ গোটা দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদের কিছু করণীয় আছে এবং তাকে সংগঠিতভাবে মোকাবিলা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেই সমস্যাগুলো কী? শুধু দেশের সমস্যাই নয় — দেশ ও বিদেশ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই আপনাদের চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। কারণ, আপনারা কী চান? আপনারা লড়ছেন কেন? সংগঠন তৈরি করছেন কেন?

আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে, আপনারা সংগঠন গড়েছেন এজন্য যে, প্রতিদিনের যে দুঃখ-দুর্দশা বা তকলিফ, জমির মালিকদের চাপ এবং পুলিশের অত্যাচার, তাকে মোকাবিলা করার জন্যই এই সংগঠন — তাহলে আমি বলব আপনারা ভুল করেছেন, শুধু শুধু এই সংগঠন গড়েছেন। এই সংগঠন গড়ার পিছনে এত স্বার্থত্যাগ এবং পরিশ্রম করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কেন না, এভাবে আপনারা আপনাদের সমস্যা সমাধান করতে পারবেন না। জীবনভর আপনাদের লড়তে হবে। আপনাদের পূর্বপুরুষরা লড়ে গেছেন, আপনাদের বংশধরেরাও লড়বেন, তাদের বংশধরেরাও নিশ্চয়ই লড়বেন, আর লড়তে লড়তে শেষ হয়ে যাবেন, কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না, যদি আপনারা না বোঝেন যে, এই অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন করতে হলে আপনাদের কী কী করা দরকার। কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যদি লড়াইগুলো পরিচালনা না করে, তাহলে তার সত্যিকারের শক্তিবৃদ্ধিও হবে না এবং মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে আপনারা অনেক দূরে থেকে যাবেন, তার কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

তাহলে সেই মূল লক্ষ্য কী? সেই মূল লক্ষ্য হচ্ছে চাষী ও মজুরের সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি; বর্তমান ব্যবস্থায় চাষী, মজুর, নিম্নচাষী, মধ্যচাষী সকলেই যেভাবে শোষিত হচ্ছে, তা থেকে মুক্তি। এ-মুক্তি চাষী এবং মজুরকে নিজেদেরই অর্জন করতে হবে। এ-মুক্তি বাবুরা এনে দেবে না, কংগ্রেসিরা এনে দেবে না, কোনও মন্ত্রী বা নেতা এনে দেবে না — দিতে পারে না। প্রত্যেকের মুক্তি তাকে নিজেকেই অর্জন করতে হবে। তাই চাষী মজুরের যে মুক্তি দরকার, সেটা তাকেই অর্জন করতে হবে। আর আমাদের এ কথাটা বুঝতে হবে যে, একা একা আমরা কেউ মুক্তি অর্জন করতে পারি না, তাই আমরা সংঘবদ্ধ হই, সংগঠন গড়ে তুলি। কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন তৈরি করার উদ্দেশ্যও তাই। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আপনারা এই সংগঠন তৈরি করেছেন — খেতমজুর, ভাগচাষী, গরিবচাষী, নিম্নচাষী, নিম্ন মধ্যচাষীদের এই সংগঠনের পতাকাতলে জড়ো করছেন। জড়ো করতে গিয়ে কী দেখছেন? দেখছেন জমিতে যারা চাষ করে জমির মালিক তারা নয় বা জমির ফসলও তারা ভোগ করে না। ফসলের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে একটা ন্যূনতম অংশ তারা ভোগ

* পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালে বিহারের মজফফরপুর সম্মেলনে এ আই কে কে এম এস বা অল ইন্ডিয়া কৃষক ও খেতমজুর সংগঠন নামটি গৃহীত হয়।

করে মাত্র। যারা ভাগচাষী, এটা হল তাদের অবস্থা। আর যারা খেতমজুর তারা অত্যন্ত কম মজুরির বিনিময়ে, যাতে তাদের অন্ন সংস্থানও হয় না তার বিনিময়ে, তারা জমিতে ফসল ফলায়, অন্যান্য কাজ করে। আবার এই যে কাজ, তাও সারা বছর তাদের থাকে না। আবার যাদের অল্প জমি আছে, যারা কম জমির মালিক, তারা দেখছে এ জমিও তারা দু'দিন বাদেই ধরে রাখতে পারবে না, হাতছাড়া হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে, সংসারের চাপে কোনও উপায় না দেখে যতটুকু জমি আগে ছিল তাও ক্রমাগত বিক্রি করে দিতে তারা বাধ্য হবে। আপনারা আর কী দেখছেন? আপনারা দেখছেন যে, জমিতে চাষ করে একদল লোক, আর একদল, যারা কোনওদিন লাঙলে হাত দেয় না, জমি থেকে সুখ সুবিধা আরাম ভোগ করে মুষ্টিমেয় এরকম অন্য কিছু লোক। যারা জমির মালিক, হয়তো কোনওদিনই লাঙলে হাত দেয়নি, হাত দিতে জানেও না — গ্রামেই থাকুক আর শহরেই থাকুক — ফসলের আসল যে আরাম সেটা তারাই ভোগ করে, তারাই নেয়, কারণ তারা মালিক। আর এই মালিকী ব্যবস্থা যেমন গ্রামে, তেমনই শহরেও সেই একই মালিকী ব্যবস্থা। শহরের সমস্যাও তাই। শহরের মজুরদের সামনেও মূলত একই সমস্যা।

প্রতিটি জিনিস যা মানুষের কাজে লাগে, ভোগে লাগে, যা মানুষের ব্যবহারে লাগে — তা সব কিছুই মজুররাই তৈরি করে। কিন্তু তার থেকে যে আরাম, সে আরামটা ভোগ করে মুষ্টিমেয় মালিক। আর মজুর তার পরিশ্রম বিক্রি করে একটা ন্যূনতম মজুরি পায় মাত্র। এমন একটা মজুরি পায় যা দিয়ে তার মানুষের মতো জীবনযাপন করা চলে না। ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানো, তাদের মানুষ করা তো দূরের কথা, দু'বেলা পেটভরে খাওয়া বেশিরভাগ সময়ই তার মুস্কিল হয়। তাই চাষী মজুরকে বুঝতে হবে যে, এই ব্যবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন তাদের অবস্থার কোনও সুরাহা হতে পারে না, তাদের সমস্যা দিনের পর দিন বাড়তেই থাকবে। কাজেই চাষী মজুরের স্বার্থ একটাই —সেটা হচ্ছে এই মালিকী ব্যবস্থাকে খতম করে দেওয়া। জমি বলুন, কলকারখানা বলুন — তার মালিক থাকবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক, আর সাধারণ মানুষ, হাজার হাজার কোটি কোটি মানুষ শুধু তাদের পেট চালাবার জন্য দিন রাত খেটে মরবে, আর এই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে মালিক মুনাফা লুটবে, আরাম ভোগ করবে, তার সুখ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে — এই অন্যায় ব্যবস্থা চলতে পারে না। এ ব্যবস্থা অন্যায়, তবু দেখুন একে গরকানুনি বা বেআইনি বলা হয় না। দেশের কানুনি ব্যবস্থাটাই এরকম! এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়াই তার কাজ। এখানে মালিক বেআইনি মালিক নয়, আইনসম্মত মালিক। মজুরকে ঠকিয়ে মুনাফা লোটার, তাকে শোষণ করার আইনসঙ্গত অধিকার মালিকের রয়েছে। জোতদার অর্থাৎ বড় বড় জমির মালিকদের চাষীদের শোষণ করার রয়েছে আইনসম্মত অধিকার। তাই আইনের লড়াই করে চাষীদের হাড়মাস এক হয়ে যায়, কিন্তু আইনের হদিশ তারা পায় না। যেখানেই যায় সেখানেই চাষীরা দেখে যে, এদেশের আইন মালিকের স্বার্থই রক্ষা করে। তাই বলছিলাম, যে ব্যবস্থায় কলকারখানার মালিক, জমির মালিক এবং শাসক ও শোষকের স্বার্থ দেখাই হচ্ছে আইনের কাজ, সে ব্যবস্থাটা আমাদের ভাঙতে হবে। আর যদি এ ব্যবস্থা ভাঙতে না পারি, তাহলে আমাদের যতই তকলিফ হোক, আমরা তার বিরুদ্ধে যত লড়াই-ই করি না কেন, এর মীমাংসা হবে না। কেননা, এই শোষণ ও অত্যাচারটা আসছে কোথা থেকে? জুলুমটা আসছে কোথা থেকে? বেকার বাড়ছে কেন? এই সবের কারণ আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে এবং সঠিক উত্তর খুঁজে বের করতে হবে।

একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে আজ যারা খেতমজুর, এমন একদিন ছিল যখন তাদের পূর্বপুরুষদের সকলেরই জমি ছিল। তাদের পূর্বপুরুষরা খেতমজুর ছিল না, তারা ভূমিহীন চাষীও ছিল না। অথচ আজ সেসব জমি বেহাত হয়ে গেছে। তাহলে এই যে জমি বেহাত হয়ে গেছে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বেশিরভাগ জমি চলে গেছে, তার কারণ কী? সেটা কিসের জন্য ঘটল? আপনাদের সংগঠনের প্রত্যেকটি সংগঠক, প্রতিটি সভ্যকে এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে এবং চাষী, মজুর, গরিব, মধ্যবিত্ত — সমস্ত মানুষের কাছে এই উত্তর পৌঁছে দিতে হবে। সকলেরই ঘরে ঘরে অভাব, ঘরে ঘরে দুঃখ তকলিফ, ঘরে ঘরে বিক্ষোভের কথা আমরা জানি। মানুষের মধ্যে বিক্ষোভ আছে, অসন্তোষ আছে, মানুষ লড়তেও চায়। কিন্তু সেই লড়াইটা কী ধরনের লড়াই, কার বিরুদ্ধে লড়াই, কীভাবে লড়তে হবে এবং কতদূর যেতে হবে তার সঠিক পথটা আমাদের জানা নেই। কখনও একটা সমস্যা দেখা দিলে, অভাব দেখা দিলে, তখন আমরা তার বিরুদ্ধে লড়ি। কিন্তু তার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি না যে, এই অভাব আসার দরজাটা এ-সমাজে খোলাই আছে। আজ যে অভাবের বিরুদ্ধে লড়লাম, জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করে লড়লাম, সেই যন্ত্রণা আসার দরজাটা কিন্তু আমাদের এই লড়াই

সত্ত্বেও খোলাই রইল। ফলে এ-যন্ত্রণা আবার আসবে, কাল পরশু রোজ ঘুরে ঘুরে আসবে, আর আপনাদের তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। যেমন, খাদ্য সমস্যা দেখছেন। প্রতি বছর আসছে, আর প্রতিবারই লড়ছি। সমস্যা আসার দরজাটা খোলা রেখেই আমরা লড়ছি। এ তো বড় মজার কথা! যেমন একটা ফুটবলের ব্লাডার, তার মধ্যে যদি একটা ফুটো থাকে, আর আপনি ফুঁ দিতে থাকেন, এ ফুঁ দেওয়ার শেষ নেই। আপনি জীবনভর পাম্প করতে থাকবেন, আর পাম্প বন্ধ করলেই সমস্ত বাতাস বেরিয়ে যাবে। কারণ ফুটো রয়েই গেছে। সুতরাং যে লোক বুদ্ধিমান, সে প্রথমে ফুটোটা খুঁজে বের করে, তারপর তাকে 'সলিউশন' দিয়ে বন্ধ করে, তারপর তাতে পাম্প দেয়। আর নাহলে এই পাম্প করার কোনও শেষ নেই।

সুতরাং এখানেও সেই একই প্রশ্ন এসে যায়। আমাদের এই সমাজব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলো ফুটো আছে, যে ফুটোগুলো দিয়ে শোষণ, জুলুম, অত্যাচার, প্রতিদিন হুড়মুড় করে এসে পড়ছে, যেগুলোকে আমাদের 'সলিউশন' দিয়ে বন্ধ করতে হবে। এখানে সেই 'সলিউশন'-টা আঠা বা রাবার নয়, সেই সলিউশনটা (সমাধান) হচ্ছে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে ভাঙা এবং নতুন একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা, মালিকদের মালিকানা থেকে হটিয়ে দেওয়া, চাষী-মজুর রাজ কায়েম করা। বর্তমানের আইনকানুন, সৈন্য-সামন্ত, সরকারি ব্যবস্থা, এগজিকিউটিভ অর্থাৎ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, পুলিশ এবং বিচারবিভাগ এগুলোর আমূল পরিবর্তন করে জনগণের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে, অর্থাৎ গণকমিটিগুলোর হাতে, বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষের সংগ্রামী কমিটিগুলোর হাতে, একটা নতুন সমাজের ভিত্তিতে, নতুন আইনকানুন, বিচারবিভাগ, পুলিশ-মিলিটারি — সমস্ত কিছু পরিচালনা করা। তেমন একটা ব্যবস্থা আপনাদের কে করতে দিচ্ছে? অথচ তেমন ব্যবস্থা গড়ে না তুললে আপনাদের বাঁচবার দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। কিন্তু সে-ব্যবস্থা আপনাদের করতে দেবে কে? সে-ব্যবস্থায় লাভ চাষী, মজুর, জনসাধারণের; কিন্তু যারা এই সমাজে বহাল তবিয়তে আছে, আরামে আছে, যারা মালিক, তাদের কোনও লাভ নেই। তাই মালিকরা তাদের আরামকে চিরস্থায়ী করার জন্য মোটামোটা আইনের বই বের করেছে, তাদের যত পাণ্ডিত্য, যত মাথা সব ঘামিয়ে নানা আইন তৈরি করেছে; যে আইনের জিলিপির প্যাঁচে সাধারণ মানুষ আটকে গেছে, তার থেকে আর বের হতে পারছে না। আমাদের এই আইনের প্যাঁচের মধ্যে ঢুকলে চলবে না, এই আইনের বই সুদ্ধ জলে ফেলে দিতে হবে, এই আইনি ব্যবস্থাকেই ভেঙে ফেলতে হবে, এবং তার বদলে নতুন আইন তৈরি করতে হবে। কিন্তু আমরা যদি বুদ্ধিমান সাজতে গিয়ে ঐ আইনের প্যাঁচের মধ্যে একবার পা দিই, তাহলে আমরা শুধু এই প্যাঁচের জালে জড়িয়ে যাব। অক্টোপাসের মতো পেঁচিয়ে যাব। আর বের হতে পারব না। তাই ঐ আইনের প্যাঁচে না ঢুকে আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবিরোধী এই আইনি ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে চাষী-মজুর ও সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী নতুন আইনের ভিত্তিতে নতুন সমাজব্যবস্থা গড়তে হবে। আর তার জন্য চাই খেতমজুরদের সংগঠন, চাই মজুর ও চাষীর নিজস্ব দল। অর্থাৎ, শুধু খেতমজুরদের সংগঠন নয়, মজুর, চাষী, ছাত্র, যুব, মধ্যবিত্ত এদের সংগঠনগুলোকে একটা রাজনৈতিক দৃষ্টি ও মতবাদ অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য, সঠিক রাস্তায় পরিচালনা করার জন্য চাই শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব একটা দল। খেতমজুর ফেডারেশন হচ্ছে খেতমজুর, ভূমিহীন চাষী, নিম্ন চাষী, নিম্নমধ্য চাষীর দৈনন্দিন লড়াই পরিচালনা করার সংগঠন এবং চাষী ও খেতমজুরদের নিজস্ব যে দল, সে দল হচ্ছে এস ইউ সি আই। তাহলে রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠন, এ দুটোর মিলন ঘটাতে হবে, এই দুটোকে একত্রে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে, একটার নেতৃত্বে আর একটাকে, পার্টির নেতৃত্বে গণসংগঠনকে পরিচালনা করতে হবে। কোথায়, কোন উদ্দেশ্যে চালাতে হবে? এই সমাজব্যবস্থাকে ভাঙবার উদ্দেশ্যে। আর এই ব্যবস্থাকে ভাঙার রাস্তা একটাই — সেটা হচ্ছে বিপ্লবের রাস্তা। তাই বিপ্লব সফল করার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের লড়তে হবে।

কিন্তু এই লড়তে হবে কথাটার অর্থ কি? কীসের জন্য লড়তে হবে? লড়ব মানে কি রাস্তা ঘাটে ইটপাটকেল ছুঁড়ব, শুধু দু'পয়সা বাড়িয়ে দাও, তার জন্য লড়ব? না, আমাদের লড়াইটা এমন লড়াই নয়। 'জমি চাই, ফসলের ভাগ চাই, জলসেচের ব্যবস্থা কর, টেস্ট রিলিফ চাই, এটা চাই, ওটা চাই' — এসব নিয়ে নিশ্চয়ই লড়ব। এজন্য লড়ব যে, চাষী মজুর তো এই লড়াইগুলোই করতে শেখেনি। সে আজ একা একা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। আর খোদাকে দেখাচ্ছে, ভগবানকে দেখাচ্ছে, অদৃষ্টের দোহাই দিচ্ছে, আর না হয় ঘরে বসে বৌ-এর আঁচল ধরে কাঁদছে। বসে বসে এই সব করছে। কাজেই চাষী-মজুরকে দৈনন্দিন এই লড়াইগুলো কীভাবে করতে হবে, সেটা শেখাতে হবে। এই লড়াই-এর মধ্য দিয়েই দেখাতে হবে যে, দেখো, ঐক্যবদ্ধ হলে

কী ধরনের তাকত পয়দা হয়। একা লড়লে যেখানে মার খাও, হাজার লোক জড়ো হয়ে যদি লড়ো, তাহলে যারা কথায় কথায় তোমাদের মারতে আসে, তাদেরও শায়েস্তা করা যায়। হাজার লোক জমায়েত হতে দেখলে, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' শুনলে, তাদেরও বুক কাঁপে।

এই মারখাওয়া পোড়খাওয়া চাষীর শক্তি যে কতটা এবং কোথায় তা লুক্কায়িত থাকে — সে সব দেখলে, নিচু স্তরের এই মানুষগুলোকে যারা মানুষ বলে গণ্যই করে না, সেই বাবুদের বুকেও কাঁপুনি লেগে যায়। অথচ কী অদ্ভুত ব্যাপার। 'তোরা আবার মানুষ নাকি' — বাবুদের কাছ থেকে একথা শুনতে শুনতে চাষীদের নিজেদেরও অনেকের ধারণা হয়, 'আমরা আবার মানুষ নাকি'? তাদের অনেকেরই ধারণা, আমাদের আবার কী? দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের সংস্থান হলেই হল। যারা এইটুকু মাত্র সংস্থান করতে পারে, তাদের তো ভাবখানা এই যে, যেহেতু তাদের খাবার আছে, তারা তো লাটসাহেব, খাঞ্জা খাঁ। কারণ, তার দু'বেলা ভাতের সংস্থান আছে, তাই তার কোনও অভাব নেই। তিনি পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে শুরু করলেন — তাঁর কোনও অভাব নেই। এই হল চাষীর মনোভাব। আমাদের দেশের চাষীর এটাই মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড (ন্যূনতম মান)। সেটা কী? দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় কিনা, মাথা গোঁজবার মতো একটা ঝোপড়ি পাওয়া যায় কিনা, যা দেখে এমনকী ভূত পর্যন্ত পালিয়ে যায়। আর আমাদের দেশের চাষীরা এতেই অভ্যস্ত। সেই ঝোপড়ির মধ্যে একটু ছিদ্র করে জানালা করে যে থাকে, সে তো নিজেকে মনে করে সে একজন আমির, মস্ত বড় লাটসাহেব। কেননা, সে ঘরে জানালা লাগিয়েছে। কেউ ভাতের সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা মিশিয়ে খেলে, বলে, ও বুর্জোয়া হয়ে গেছে। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে যারা ভাত খায়, তারা তো বেশ রসিক লোক — আমাদের দেশের বুর্জোয়ার সংজ্ঞাটা অনেকটা এইরকম। যে নাকি একটু তরকারি খেতে পায়, একটু তেল-টেল দিয়ে রান্না করে খেতে পায়, সে তো রেগুলার বুর্জোয়া ব্যাপার। সুতরাং যাদের একটুও জোটে না, তাদের একটু লড়াই-টড়াই করতে হয়। তাও তার জন্য তাদের পঞ্চাশবার ডাকতে হয়। নাহলে হয়তো ভিক্ষে করার জন্যই বেরিয়ে গেল। কিন্তু তবুও লড়াইয়ের কথাটা মাথায় আসে না।

কিন্তু এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? কেন তারা এমনভাবে জীবনযাপন করে? তারা এতটুকু ভাবে না, এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? কেন এরকম জীবনযাপন করতে হচ্ছে? তারা দুনিয়ায় কী অপরাধ করে এসেছে? তার বাচ্চা ছেলেটা, যে ফুলের মতো নরম, যে দুনিয়া কী এখনও পর্যন্ত জানল না, পাপ কি, পুণ্য কি, ভাল মন্দ কিছুই জানল না, কিছুই বুঝতে শিখল না — সেই বাচ্চা ছেলেটা কী অপরাধ করেছে? ও তো অপরাধ করার কোনও সময়ই পেল না, কোনও সুযোগই পেল না, তাহলে ও কেন না খেয়ে মরবে? আজ পরিস্থিতি এমন যে, এর জবাবটা খোঁজবার মন এবং ইচ্ছাটাও যেন চাষী-মজুর হারিয়ে ফেলেছে। তাদের মধ্যে সেই মনটা আমরা জাগাতে চাইছি। যখন পেটে টান ধরে তখনকার সমস্যাটা মানুষ বোঝে। কিন্তু ভেবে-চিন্তে দুঃখের চেহারা বোঝা একটা কঠিন কাজ। আমরা তাদের মনের ভাবনাটাকেই রাস্তা করে দিতে চাইছি। যে কথাটা মানুষ সহজে বোঝে, সেই কথাটা নিয়েই আমি তার কাছে যাব। সহজ কথাটা বুঝিয়ে টেনে আনার সাথে সাথে তাকে দেখাতে হবে, এর পেছনে জটিল কথাটা কী। সেই কথাটা তাকে বোঝাতে হবে। সে যখন বুঝবে তখন তার পাশের লোককে আবার সেই কথাটাই সে বোঝাবে। এইভাবে সকলে সকলকে বোঝাব, প্রত্যেকে প্রত্যেককে বোঝাব।

ওরা আমাদের বোঝাতে চাইছে, আমরা অমানুষ, আর আমরা সকলে এমনভাবেই ভাবতে থাকি। কিন্তু আমি বলছি, আপনাদের ঠিক উল্টো কথাটা বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, ওরা যা বলছে, সেটা ঠিক, নাকি উল্টোটাই ঠিক। তাহলে এই সত্যটা বেরিয়ে আসবে যে, আমরা অনেক কিছু পারি, কিন্তু একা করতে পারি না। পাঁচজনে মিললে অনেক কিছু করতে পারি। এমন জিনিস করতে পারি, যা ওরা ভাবতেও পারে না। সেটা ওদের দুঃস্বপ্ন। মানুষগুলোকে সেইভাবে জাগানো দরকার। সেভাবে তারা তখনই জাগতে পারে যখন তাদের সেই রাজনৈতিক চেতনা আমরা দিতে পারব। যখন আমরা দেখাতে পারব, বোঝাতে পারব যে, তাদের এই শোষণ, জুলুম, অত্যাচার, অভাব, অনটন, বেকারি, জমি চলে যাওয়া, তাদের জীবনের যা কিছু দুর্ভোগ, এর জন্য অদৃষ্ট দায়ী নয়। এর জন্য পূর্বজন্মের পাপ দায়ী নয়। টোলের পণ্ডিত আর সাধু-সন্ন্যাসীরা যাই বোঝাক, এসব সত্য নয়। রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরের প্রথম অধিবেশনের আলোচনায় সেসব কথা আপনারা কিছু কিছু শুনেছেন। তাই যে সব সাধু-সন্ন্যাসী এসব কথা বোঝাতে আসবে, মনে রাখতে হবে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। যেসব সাধু-সন্ন্যাসী অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, আমরা তাদের মাথায় করে রাখব।

কিন্তু যারা ঐ অদৃষ্ট, পূর্বজন্ম, এসব কথা বোঝাতে আসবে, জেনে হোক, না জেনে হোক তারা সাধারণ মানুষের মনকে দুর্বল করে দিতে চায়, যাতে মানুষগুলো লড়াইয়ের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। ফলে বাস্তবে তারা জোতদার বা মালিকের এজেন্ট হিসেবেই কাজ করে। একথা হিন্দুদের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, মুসলমানদের ক্ষেত্রেও সত্য। কাজেই এইসব ধর্ম প্রচারকদের কাছ থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। চাষীদের একটা সোজা কথা সোজাভাবে বুঝতে হবে। ধরুন, আপনি না হয় পাপ করেছেন, কিন্তু আপনার ঐ দু'মাসের ছেলেটা তো কিছু করেনি, পাপ করার সময়ই তো সে পায়নি, অপরাধ করার কোনও সুযোগ তার জীবনে ঘটেনি। কাজেই সে বেচারা না খেয়ে মরবে কেন? এর জবাব দিতে হবে। অথচ যে বড়লোক, যে পুঁজিপতি বা জোতদার চব্বিশ ঘণ্টা অন্যায় করছে, জুলুম করছে, বদমাইসি করছে, তার বাচ্চা ছেলেটা কেমন বহাল তবিয়তে আছে। এ অসাম্য কেন? এর জবাব দিতে হবে। কে জবাব দেবে? ভগবানকে যদি পাওয়া যেত তো তাকে ধরেই জবাব নিতাম। কিন্তু যে ভগবানকে তোমরা আজ পর্যন্ত হাজির করতে পারলে না, তার কাছে আবার জবাব চাইব কী! তাই জবাব চাইতে হবে তাদের কাছে, যাদের কাছে জবাব চাইবার উপায় আছে। ভগবানের চেলা চামুণ্ডা, অর্থাৎ টোলের পণ্ডিতদের, শাস্ত্রকারদের, মসজিদের মোল্লাদের দু'বেলা পায়ের ধূলো যারা নেয়, আর টাকা-পয়সা দিয়ে পালে, সেইসব কংগ্রেসি মিনিস্টার, জোতদার, জমিদার এদের কাছ থেকে এসব প্রশ্নের জবাব চাইতে হবে। তাদের এসব করার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। এই ভগবানের নাম করে, অদৃষ্টের নাম করে মূল সমস্যা থেকে তারা মানুষের দৃষ্টি সরাতে চায়। কাজেই ভগবানের এইসব জ্যান্ত প্রতিনিধিদের কাছেই আমাদের এর জবাব চাইতে হবে। কেন এই অনাচার, অবিচার, অত্যাচার — এর জবাব তাদের দিতে হবে।

সুতরাং, এই যে খেতমজুর ফেডারেশন আমরা গড়েছি, সেটা কোনও একটা থানার জন্য, কোনও বিশেষ এলাকার জন্য নয়, গোটা দেশের জন্য এবং এক্ষেত্রে গোটা পশ্চিমবঙ্গের জন্যই আমাদের এই সংগঠন। সম্মেলনের শুরুতে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, তাতে সংগঠকদের একটা কূপমণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গি আমার নজরে পড়েছে, যেটা সংগঠনের একটা মস্ত বড় ত্রুটি। যাঁরা সংগঠনের দায়িত্ব নেবেন তাঁদের স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গি, কূপমণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে হবে। সংগঠকদের কাছে এটা আমার একটা আবেদন। তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, গোটা দেশের চাষী ও মজুরদের এই চেতনা এবং এই চেতনার ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলার ভার তাঁদের উপর। এটা কে গড়বে? কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন ছাড়া এমন আর কোনও সংগঠন আছে কি যাদের এই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি আছে? যাদের সত্যিকারের বিপ্লবী চরিত্র আছে এবং বিপ্লবী উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা তৈরি? আমরা মনে করি, নেই। আমরা মনে করি, স্বচ্ছ বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি, সুদৃঢ় বিপ্লবী উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এদেশে কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন ছাড়া দ্বিতীয় কোনও কৃষক সংগঠন নেই। নেই বলেই রক্তমাংস দিয়ে এই সংগঠনকে আমাদের গড়তে হবে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে শুধু একটা স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা সংগঠকদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। এই জন্য মারাত্মক যে, প্রত্যেকটি সংগঠক যদি শুধু তার নিজের এলাকা নিয়ে একটা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব নিয়ে চলে এবং তার মধ্যে যদি একটা বাহাদুরির মনোভাব থাকে যে, তারা খুব করছে এবং তার বাইরে যদি তারা আর কিছু দেখতে না পায়, দেখবার চোখ তাদের না থাকে, তাহলে দাঁড়াবে কী? এর ফল হবে এই যে, গোটা ভারতবর্ষ তো দূরের কথা, এমনকী গোটা পশ্চিমবাংলা জুড়ে, তার বিভিন্ন জেলা জুড়ে যে অগণিত কৃষক ও খেতমজুর রয়েছে, তাদের আমরা সংগঠিত করতে পারব না। তাহলে আমাদের এই সংগঠনটা অনেকটা অদৃষ্টের মতো একটা ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যাবে। এর দ্বারা যে কথাটা আমি বোঝাতে চাইছি, তাহল, কোথাও যদি কোনও সংগঠক এসে যায়, তবে সেই জায়গায় আমাদের সংগঠন হবে, নাহলে হবে না! পরিস্থিতি এরকম দাঁড়ালে সংগঠনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিতই থেকে যাবে। আসলে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে নেতাদের এই সংগঠনকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে। তাই বলছিলাম, নেতাদের স্থানীয় সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, দৈনন্দিন সংগ্রামের স্থানীয় খুঁটিনাটির ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। কাজটা যত কঠিনই হোক, একাজ নেতাদের করতে হবে। আমি এই কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই, আমাদের এই কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে এইটাই যে, তার নেতৃস্থানীয় সংগঠকদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত এবং তারা নিজেরাই স্থানীয় সমস্যায় জর্জরিত। এটা নেতৃত্বের একটা মস্ত বড় দুর্বলতা।

তাই আমি বারবার বলছি যে, স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠে নেতারা যদি সারা বাংলাদেশে আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বানকে ছড়িয়ে দিতে না পারেন, তার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা না নিতে পারেন,

তাহলে আপন নিয়মে এ সংগঠন গড়ে উঠবে না। তখন সবটাই নির্ভর করবে চান্স-এর উপর, স্বতঃস্ফূর্ত একটা আন্দোলন গড়ে ওঠার উপর। যেমন ধরুন, মেদিনীপুর জেলা বা এরকম বেশ কিছু জেলা আছে যেখানে আপনাদের এখনও কোনও কাজ শুরু হয়নি। একটু পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করলে দু-এক বছরের মধ্যেই আপনাদের সংগঠনের কাজকে আপনারা ছড়িয়ে দিতে পারেন। আপনাদের যা কর্মী সংখ্যা বা স্টাফ যারা তাদের মধ্যে যোগ্য কর্মী, যারা সংগঠক পর্যায়ের, এমন সব সংগঠকদের বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে 'ডেপুট' করে কাজ করালে এর মধ্যেই প্রতিটি জেলায় আপনারা অনেকটা এগিয়ে থাকতে পারতেন। আপনারা নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন, এতদিন সেভাবে নিয়মিত কাজ আপনারা পরিচালনা করেননি। সেভাবে কাজ হয়নি। কেন হয়নি? আপনাদের জিজ্ঞেস করলে বলবেন, 'অবস্থা দায়ী'। আমি ঘটনাচক্রে নেতা হয়ে গেছি। কিন্তু এই 'অবস্থা দায়ী' কথাটা আমি মানতে রাজি নই। অবস্থা যত কঠিনই হোক, সেই অবস্থাকে পরিবর্তন করাই হচ্ছে নেতার কাজ। নেতা হয়েছেই সেজন্য। অবস্থার দোহাই দেওয়ার জন্য নেতা হয়নি। কর্মী হিসেবে যেসব চাষী কর্মী এলেন, তাঁদের সকলেই যে নেতা হবেন, তা নয়। অল্প যে ক'জন নেতা হওয়ার উপযুক্ত, তাঁরা সাধারণ কর্মী থেকে কিছুটা পৃথক। তাঁদের কর্মক্ষমতা ও তাঁদের সমস্যা, আর অপরের কর্মক্ষমতা ও অপরের সমস্যা এক নয়। কিছুটা পার্থক্য থাকতে বাধ্য। এর দ্বারা আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, তাহল, এই বিপ্লব কথাটার যে কার্যকরী দিক, তার দিকে আমরা যদি একটু নজর দিই, তাহলে বুঝতে পারব যে, সেটা 'থোড় বড়ি খাড়া — খাড়া বড়ি থোড়' নয়। কিন্তু আপনাদের মনোভাব অনেকটা এরকম, যা আছে, যতটুকু আছে, তাকেই একটু নেড়ে-চেড়ে নাও। এসব মনোভাব আপনাদের ঝেড়ে ফেলতে হবে। সংগঠনকে বাড়াতে হবে, তবে মাত্রা রেখে। বাড়াবার জন্য পাগল হয়ে গেলাম, যা ছিল তাও রইল না, তছনছ হয়ে গেল — এরকম নয়। যা আছে, যতটুকু আছে, তাকে রক্ষা করতে হবে, শক্তিশালী করতে হবে, সাথে সাথে সংগঠনকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কার্যকরী পরিকল্পনা নিতে হবে। সেই পরিকল্পনা নেওয়াটা সংগঠকদের কাজ। সেজন্যই নেতা ও সংগঠকদের কাছে আমার বিশেষ আবেদন, আপনারা নিজেরা বসুন এবং কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। আপনাদের রিপোর্টে যে আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব আমি লক্ষ করেছি সেটা যে আমার ভাল লাগেনি, তা আমি আগেই বলেছি। এই রিপোর্ট যদি দশ বছর আগে হত, তাহলে আমি খুশি হতাম।

এখন, গ্রামের কর্মীদের কাজের ধারার মধ্যে একটা ট্রেন্ড (ঝোঁক) আমি বরাবরই দেখে আসছি। সেটা হল, যে কোনও ছোটখাটো কাজে ফেঁসে যাওয়া। যে যেখানে গেলেন, সে সেখানেই ফেঁসে গেলেন। এই সমস্যাটা আমাদের ভাল করে বোঝা দরকার। ধরুন, নেতারা কোনও এলাকায় গেলেন। গিয়ে দেখলেন, সেখানে স্থানীয়ভাবে একটা আন্দোলন চলছে। আর অমনি তিনি সেই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। সেই এলাকার সাধারণ মানুষ তো নেতাদের জড়াতে চাইবেই। তাদের দিক থেকে সেটা অস্বাভাবিক, তা নয়। কিন্তু নেতারা তাতে জড়িয়ে যাবেন কেন? তাঁরা হয় জড়িয়ে যাবেন, নাহয় তাঁরা আর কোনও কিছুর মধ্যেই থাকবেন না, এইরকম মনোভাব ঠিক নয়। নেতাদের এইসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে হবে। করণীয় যা কাজ তা করিয়ে দিয়ে আসতে হবে, যাতে স্থানীয় কর্মীরাও নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে আন্দোলন পরিচালনা করতে পারেন। আবার নেতারা নিজেরাও যাতে এইভাবে আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন, সেদিকে তাঁদের লক্ষ রাখতে হবে। সংগঠন গড়ার এইসব আর্ট বা কৌশল তাঁদের আয়ত্ত করতে হবে। এইভাবে ফেঁসে যাওয়া থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। নেতৃত্বকারী কমরেডদের সাথে কথা বলে আমি আর একটা ব্যাপার দেখেছি যে, কোর্টে যাওয়া আর কেস তদ্বির করাটাই যেন অনেকের মূল কাজ হয়ে পড়েছে। কোর্টের কাজ যদি দেখতেই হয়, সে সব কাজ দেখবার জন্য আপনাদের লোক বের করতে হবে। আর সাথে সাথে সংগঠনের কাজ দেখার জন্য আপনাদের সময় খুঁজে বের করতে হবে। এসব দেখাই হচ্ছে নেতাদের কাজ। তাঁরা যে কেন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজই শুধু কোর্টে যান আর আসেন, এ আমার মাথায় একদম ঢোকে না। এসব কথা যখন তাঁদের বলি, তাঁরা তখন সারাদিন কত পরিশ্রম করেন, তার ফিরিস্তি দেন। কিন্তু এসব শুনে কী লাভ? নেতাদের কাছ থেকে আমি অন্য জিনিস চাই। তাঁরা সংগঠনে নেতৃত্ব দিন আমি এটাই চাই। আমি আপনার কাছে চাইছি আপনি নেতৃত্ব দিন, আর আপনি আমাকে বোঝাতে শুরু করলেন যে, আপনি রাতদিন কত পরিশ্রম করছেন! আমি আপনাকে বললাম, আপনাকে নেতৃত্ব দিতে হবে, আর আপনি হাল চষতে চলে গেলেন, আর বললেন, দেখুন, আমি কত ভাল হাল চষতে জানি। কিন্তু এসব দিয়ে আমার কী হবে? তাহলে আপনি হালই চষুন, কিন্তু নেতৃত্বটা ছাড়ুন। নেতৃত্বটা তাঁকে করতে দিন, যিনি

নেতৃত্ব দিতে পারেন। আসলে নেতাদের কাজ হল দৈনন্দিন কাজগুলো করার জন্য লোক বের করা, তাদের দিয়ে সে-সব কাজ করানো, নিজেদের ফেঁসে না যাওয়া। আর নতুন নতুন কর্মী যাদের আমরা পাচ্ছি তাদের উপযুক্ত কর্মী হিসাবে তৈরি করা, শিক্ষিত করে তোলা এবং বিভিন্ন জায়গায় সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটাবার জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের ডেপুট করা। নিয়মিত সেই কাজগুলো দেখভাল করা এবং সে সবের জন্য সময় খুঁজে বের করা — এগুলোই হল নেতাদের সমস্যা। সংগঠকদের এটাই হল মূল সমস্যা। এ ধরনের ত্রুটি প্রায় সমস্ত জেলার সংগঠকদের মধ্যেই লক্ষ করেছি।

যেমন বীরভূমে দেখেছি, দারুণ কমপ্লাসেন্সি, আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব কী প্রচণ্ড! সেটা কী? না, আমরা কত লড়েছি, কত লড়াই হচ্ছে। আর বসে বসে 'থোড় বড়ি খাড়া' করছি। যে সব জায়গায় লড়াই হচ্ছে, সেই লড়াইয়ের সাথে সাথে অন্য যে সব জায়গায় কনট্যাক্ট ছিল সেগুলো শুকিয়ে গেল কিনা, বিচ্ছিন্ন হল কিনা, সে সব দিকে একেবারে নজর নেই। যে কয়জন যোগ্য কর্মী পেলাম, তাদের দিয়ে কীভাবে গোটা জেলাকে ধীরে ধীরে চষে ফেলা যায়, সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটানো যায়, সে সব সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। ফলে একদিন যতটুকু সম্ভাবনা ছিল, যোগাযোগ রক্ষা করার অভাবে তা হয়তো ততদিনে শুকিয়ে গেল। পরিস্থিতি যদি এরকম হয় যে, জেলা নেতৃত্ব এই সব ত্রুটি সংশোধন করতে না পারেন তাহলে সংগঠনেরই ক্ষতি সবচেয়ে বেশি। ঠিক একই ভাবে দেখুন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের সামনে এতবড় সুযোগ, এত সম্ভাবনা। অথচ আজও গোটা চব্বিশ পরগণায় আপনাদের কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনকে ছড়িয়ে দিতে পারলেন না। নেতাদের এই সব বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে এবং এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। নাহলে এই সব সম্মেলন করার মানে কী? এসবের জন্যই তো সম্মেলন, সম্পাদকের রিপোর্ট, এই সব — নাহলে এ সবের কোনও মানে নেই। তাই আমাদের নিজেদের কাজকে নিজেদের সমালোচনা করতে হবে। 'উই মাস্ট ক্রিটিসাইজ আওয়ারসেলভস্'। এত বড় একটা আন্দোলনের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকা সত্ত্বেও গোটা চব্বিশ পরগণায় সবগুলো থানাতে আপনারা আজও কাজ ছড়িয়ে দিতে পারলেন না কেন? পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতে ছড়িয়ে দেওয়া তো অনেক দূরের কথা। আপনাদের বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও একটা ত্রুটি আছে। সীমাবদ্ধতা আছে ঠিকই, এবং তা আমরা জানি। কিন্তু এটাকে এরকম অস্পষ্টভাবে বুঝলে চলবে না। আমি জানি, আপনাদের অসুবিধে আছে অনেক। অসুবিধের জন্য হয়তো হু হু করে রাতারাতি সবগুলো জেলাতেই সংগঠন খাড়া করতে পারবেন না। জয়নগর, মথুরাপুরের মতো সংগঠন দেখতে দেখতে সব জেলাতেই দু'-এক বছরের মধ্যে হয়ে যাবে — এটা অবাস্তব। কিন্তু একথা তো ঠিক যে, প্রত্যেক জায়গায় আমরা কে কে এম এফ-এর নিউক্লিয়াস (কর্মকেন্দ্র) শুরু করার মতো কিছু লোক নিশ্চয়ই তৈরি করতে পারি। এটা যে পারি, সেরকম পরিস্থিতি যে সংগঠনে সৃষ্টি হয়েছে, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

এ জন্যই বলছিলাম, একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা দরকার। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি মুহূর্তে নেতাদের মাথা ঘামাতে হবে, কাজ দেখতে হবে। এইভাবে কাজ হলে এতদিনে আমরা প্রতিটি জেলায় কয়েক বছরের মধ্যে অন্তত কর্মকেন্দ্র খাড়া করতে পারতাম, ছোট ছোট কর্মকেন্দ্রের জন্ম দিতে পারতাম। আর তাহলে সেগুলো বসে থাকতো না। সেগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে, তাতে নজর দিলে, গাইড করলে, ধীরে ধীরে সেগুলো বড় হত। সুতরাং যে কথা বলছিলাম, এই যে বিপ্লব, সমাজের আমূল পরিবর্তন, এই যে কথাগুলো আমরা বলি সে সবের কোনও সার্থকতা থাকে না যদি আমরা সাংগঠনিক দিকগুলোর উপর যথার্থ গুরুত্ব না দিই, এগুলো নিয়ে না ভাবি। আবার এটাও ঠিক যে, শুধু 'সংগঠন করব, সংগঠন করব' করলেও বিপ্লব আসবে না। সংগঠনের আদর্শগত নেতৃত্ব এবং চেতনা যেমন চাই, আবার একই সাথে সেই সংগঠনকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াও চাই। এই দুটোই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং এই দুটোকেই আমাদের মেলাতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলতে চাই। যে কোনও উপায়ে, যেন তেন প্রকারেণ কিছু লোক জড়ো করে ভোট জোগাড়ের সংগঠন আমরা খাড়া করতে চাই না। ভোটের পার্টিগুলোর যে সংগঠন দিয়ে কাজ চলে যায়, সেই ধরনের সংগঠন দিয়ে আমাদের কোনও কাজ হবে না। আমরা চাই এমন সংগঠন, যে সংগঠন শুধু জোতদারের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়বে তাই নয়, যে সংগঠন মালিকী ব্যবস্থা না ভাঙা পর্যন্ত, একটা সঠিক রাজনৈতিক চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, লক্ষ্য, আদর্শ এবং রুচি-সংস্কৃতির ভিত্তিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লড়বে। সুতরাং যেমন এই রাজনৈতিক চেতনার দিকটা খুব যত্ন করে গড়ে তুলতে হবে, আবার তারই সাথে সাথে রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংগঠনের ব্যাপ্তি ঘটছে কিনা, তার প্রতিও যত্নবান হতে

হবে। কখনও খেয়াল হল খোঁজ করলাম বা দু'চারদিন করলাম, আবার সেটা নজরের বাইরে চলে গেল — এরকম হলে চলবে না। বা কাজ করতে গিয়ে প্রথমেই যখন কিছু অসুবিধা দেখা দিল, কিছু সমস্যা দেখা দিল, অমনি বলতে শুরু করলাম, 'এই সব ছেলে দিয়ে কাজ হয় না', এরকমভাবে ভাবলেও হবে না। এই সব দেখে এটাই বার বার আমার মনে হয়েছে যে, আমরা সংগঠনের গুরুত্ব, বাস্তব অবস্থা এবং সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে এই সব বিষয়গুলোকে বিচার করতে হয়, 'ভিউ' করতে হয় — সেগুলো আজও ভালভাবে আয়ত্ত করতে পারিনি। তাই বলছিলাম যে, চব্বিশ ঘণ্টা শুধু জমির কী হল, মামলার কী হল, ঐ তদ্বিরের ব্যাপারটা কী হল — এসব করলে এই ধরনের সংগঠন, যা আমরা গড়ে তুলতে চাই, সেই বিপ্লবী সংগঠন আমরা গড়ে তুলতে পারব না।

এরপর আমি অন্য দু-একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আপনারা সম্মেলনে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তাতে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু কিছু ইঙ্গিত আপনারা পেয়েছেন। এক পশ্চিমবাংলা ছাড়া গোটা ভারতবর্ষে অন্য কোনও রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলনের বিশেষ কোনও চিহ্নই প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। নানা বিভেদ, নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, সংকীর্ণতা থাকা সত্ত্বেও আপনারা দেখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলো এই গত বছর সম্মিলিতভাবে ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন* গড়ে তুলেছিল। কতকগুলো দাবিদাওয়া ও 'ইস্যুর' ভিত্তিতে সকলে একসঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার পথে কিছু অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে, ফাটল ধরাবার চেষ্টা হচ্ছে। এই ঝোঁক আমরা লক্ষ করছি। কিছু কিছু বামপন্থী দল তাদের মনোভাব ও আচরণের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ফাটল ধরাবার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে। আর কংগ্রেস পিছন থেকে তাকেই উস্কানি দিচ্ছে। তারা চাইছে বামপন্থীদের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে যাক — একদিকে কমিউনিস্ট, আর একদিকে কমিউনিস্ট বিরোধীরা। আগে যেমন ছিল কংগ্রেস বিরোধীরা, যারা মোটামুটিভাবে পুঁজিবাদ বিরোধী, যাদের একটু বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি আছে তারা সকলে এক হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ছিল — পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের এই ছিল মোটামুটি চেহারা। এখন সেখানে নতুন করে একটা প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে বামপন্থীদের মধ্যে একদল কমিউনিস্ট, আর একদল কমিউনিস্ট বিরোধী। এতে কিন্তু কংগ্রেসেরই সুবিধা। বামপন্থীদের মধ্যে এর হোতা হচ্ছে আর এস পি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক — এই দুটো দল। এই দুটো দলই এ ব্যাপারে নষ্টের গোড়া। তাছাড়া পি এস পি এর পেছনে তাল দিচ্ছে। আর যুগান্তর-আনন্দবাজারের মতো কাগজগুলো এটাকে লুফে নিচ্ছে। তারা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিচ্ছে, অর্থাৎ কমিউনিস্ট বিরোধীদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা পাবলিসিটির জন্য ভয় করো না। দশ জনের মিটিং করলেও আমরা তাকেই বড় করে ছাপব। আর কাগজে তোমাদের বক্তৃতা ছাপিয়ে ছাপিয়ে নেতা করে দেব। কারণ, কমিউনিস্ট সমর্থকদের দিকটা সংগঠনগতভাবে বেশ ভারী। লোকজন জমায়েতের দিক থেকে, লড়াই করার ক্ষমতার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গে এরাই আসল শক্তি। বাকিগুলো সব নাম কা ওয়াস্তে। কিন্তু তবুও নামেরও, এই সম্মিলিত নামেরও একটা মানে আছে। তাই প্রথম প্রথম এইসব দলগুলো অতটা সাহস পায়নি। তারা আলাদা করে মিটিং, মিছিল, সম্মেলন করতে পারবে কিনা, পাবলিসিটি পাবে কিনা এসব কথাই তারা ভেবেছে। এখন এই কাগজগুলো এদের বুঝিয়ে দিল পাবলিসিটির জন্য তোমাদের ভয় নেই। তারা বলল, আমরাই তো নেতা তৈরি করি। কতবার কত নেতাকে শুধু প্রচার করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। চাই তো কমিউনিস্ট জ্যোতি বসুকেও দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, তোমাদের যারা নেতা, তাদেরও পারি। এই ভরসায় ওরা বর্তমানে আলাদা থাকতে চাইছে। তাতে একটা বিপত্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

শুধু যে খাদ্যসমস্যাই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, তা নয়। অন্যান্য বহু অগণতান্ত্রিক সরকারি কাজ রয়েছে, পুলিশের আচরণ রয়েছে, যার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ গড়ে তোলা দরকার। অথচ সেটা হচ্ছে না। কেননা প্রতিবাদ করবে কে? প্রতিবাদের সেই জোর আওয়াজই তো উঠছে না। জনসাধারণ বিভ্রান্ত। কে কোথায় কী করছে, এত খবর তারা রাখে না। তারা খবরের কাগজ পড়ে দেখছে যে, বামপন্থীরা বিভক্ত। ফলে, এই যে সাধারণ মানুষ, যারা কোনও পার্টির সঙ্গে নেই, যারা অনেকটা দল নিরপেক্ষ মনোভাব, নন-পার্টিজান অ্যাটিচিয়ুড নিয়ে চলে, কংগ্রেস বিরোধী যুক্ত আন্দোলন হলে আবার তারাই কিন্তু মনে জোর পায় এবং সেই আন্দোলনকে সমর্থন করে, জনসাধারণের এই অংশটা বেশ বিভ্রান্ত। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আন্দোলনের

* ১৯৫৯ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য আন্দোলন।

কোনও আওয়াজই তাদের কাছে তেমন করে পৌঁছাচ্ছে না। এতে একটা মস্ত বড় ক্ষতি হচ্ছে। কংগ্রেস অন্যায় করছে, অত্যাচার করছে, লাঠিবাজি করছে, কথায় কথায় গুলি চালাচ্ছে, ধর্মঘট ভাঙছে — এসব আবার নতুন করে শুরু হচ্ছে। কংগ্রেস এবং কংগ্রেসি পুলিশ অত্যাচার আগেও করেছে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে। এখন এরা যা কিছু করছে, লোকচক্ষুর আড়ালে করছে। খবরের কাগজে এসব খবর বের হচ্ছে না, ফলে দেশের লোক জানতেও পারছে না। আগে কোনও মেয়েকে কেউ রেপ করলে হৈ চৈ শুরু হয়ে যেত প্রচণ্ড। এখন ঘরে ঘরে ঢুকে পুলিশ রেপ করছে। কিছু হচ্ছে না। কোনও প্রতিবাদ নেই। কোনও আওয়াজ নেই, খবরের কাগজে একটা খবর পর্যন্ত নেই। এই যে পরিস্থিতি — কে কে এম এফ-এর কর্মীদের এসব খুব ভাল করে বোঝা দরকার। এই মারাত্মক অবস্থার আমাদের মোকাবিলা করতে হবে। এখন সকলে মিলে যদি এর মোকাবিলা করতে পারতাম, তাহলে ভাল হত। হয়তো তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করা যেত। যদি দেশের এমনই অবস্থা হয় যে, আর কেউ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে না, তাহলে আমরাও কি তাদের মতো মাথাটি বিকিয়ে দিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ভেগে যাব? না, এর মোকাবিলা করব? এই সব অন্যায় অত্যাচারকে মোকাবিলা করার জন্য এখনই সমস্ত শক্তি নিয়ে সংগঠনকে মজবুত করতে হবে, শক্তিশালী করতে হবে। কারণ শুধু মগজ দিয়ে আর মন দিয়ে আমরা এত বড় অন্যায়কে মোকাবিলা করতে পারব না। এসব মোকাবিলা করার জন্য তাকত চাই, সংগঠনের শক্তি চাই। এই শক্তিটা না থাকলে ইচ্ছা যতই তীব্র হোক না কেন, শুধু ইচ্ছার দ্বারা এসব সম্ভব নয়। যাতে সকলে মিলে এগোতে পারি, তার জন্য চেষ্টা আমাদের করে যেতে হবে। কিন্তু অন্যেরা যদি না আসে, তাহলে একক শক্তিতে মোকাবিলা করার জন্য প্রতিদিন প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সেজন্য সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধি প্রয়োজন। আমাদের পরিকল্পনা নিতে হবে কনসোলিডেশন অ্যান্ড এক্সপ্যানশন — এই হবে আমাদের স্লোগান। অর্থাৎ, সংগঠনকে শুধু সংহত করাই নয়, সংহত করার সাথে সাথে তার ব্যাপ্তি ঘটাতে হবে। সংগঠন যতটুকু আছে তাকে ভাঙতে দিও না। তাকে মজবুত কর, দানা বাঁধাও। আবার সেই সংহত শক্তির উপর দাঁড়িয়ে, পরিকল্পনার মারফত সংগঠনকে ছড়িয়ে দাও। এই ভাবে এক জেলা থেকে আর এক জেলায় ছড়িয়ে পড়। আর সংগঠন যেটা আছে, তাকে মজবুত কর। কিন্তু সংগঠন বাড়াবার ঝোঁকে যতটুকু সংগঠন আছে, জমিদার, জোতদারের অত্যাচারের সামনে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে আক্রমণের সামনে ফেলে দিও না। সংগঠনকে এগিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা নিতে হবে। আজ এই স্লোগানটা কে কে এম এফ-এর পক্ষে সবচেয়ে কার্যকরী স্লোগান। বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতেই এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হবে। একটা দুটো করে হলেও নতুন থানায় সংগঠন গড়ো, কিন্তু গড়ে তোল। এক মাস, তিন মাস, ছয় মাস অন্তর কমিটিকে বসতে হবে, রিপোর্ট নিতে হবে। দেখতে হবে ক'টা থানায়, ক'টা জেলায় আপনারা নতুন করে সংগঠন গড়ে তুললেন। এমনভাবে গড়তে হবে, যাতে আগামী বছর সম্মেলনে আমরা দেখতে পাই যে, একটি দু'টি করে প্রতিনিধি এলেও প্রতিটি জেলার প্রতিনিধি এসে উপস্থিত হয়েছে। সংগঠনকে সমস্ত জেলায়, সমস্ত থানায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এইসব কার্যকরী কর্মসূচি নিতে হবে। তখনই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় রাজনীতি বা অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করার একটা মানে আছে। নাহলে রাজনীতিটা এক ধরনের লেখাপড়া জানা তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালদের শখের মতো দাঁড়াবে। তাঁরা যেমন চা খেতে খেতে কিছু রাজনীতির আলোচনা করেন, অর্থাৎ চায়ের কাপের উপর রাজনীতির তুফান তোলেন, কিন্তু দেশ গোল্লায় গেলেও নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে রাজনীতিতে আসেন না। কিন্তু আমাদের রাজনীতিটা সেরকম নয়। আমরা এই যে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছি, তার একটা মানে আছে। আমরা এসব শিখছি তাকে প্রয়োগ করার জন্য, জ্ঞান অর্জন করছি তাকে বাস্তবে কাজে লাগাবার জন্য। কাজেই এটা আমাদের শখ নয়। আপনারা, লেখাপড়া না জানা লোকগুলো, যাঁরা এখানে সমবেত হয়েছেন, লেখাপড়া না জেনেও কষ্ট করে এমন সব জিনিস আপনারা জানছেন, শিখছেন যা ঐসব পণ্ডিতরাও বুঝতে পারেন না। এমন সব বিষয়ের মধ্যে আপনাদের নাক গলাতে হচ্ছে। এসব কি শখ করার জন্য? না, এটা হল সংগঠনকে মজবুত করার জন্য, যেটা আমাদের বেঁচে থাকার যে লড়াই, তাতে সাহায্য করবে। কাজেই বসে থেকে সময় নষ্ট না করে সংগঠনকে আপনারা গড়ে তুলুন — এই আবেদনই আমি করছি।

তাহলে যে কথা বলছিলাম, অর্থাৎ আমাদের দেশে বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা এবং কংগ্রেসি আক্রমণের রূপ নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম; গত বছর খাদ্য আন্দোলনের পর অনেকে ভেবেছিলেন যে, পুলিশের এবার বোধহয় কিছুটা শিক্ষা হবে। কিন্তু কিছু হল না, বরং উল্টো। অতবড় একটা আন্দোলনে

পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলায় ভাল করে একটা প্রতিবাদ হল না। এরকম জুলুম ইদানীং কালের ইতিহাসে পুলিশ করেনি। ব্রিটিশ আমলেও অনেকদিন হয়নি। এরকম নৃশংস বর্বরতা করেও আজ আমাদের দেশের পুলিশ বক্তৃতা দেয়, তারা সমাজসেবক। তারা স্বাধীন দেশের পুলিশ। এই সব কত কথা। আর অন্যদিকে জনসাধারণ বিভ্রান্ত। আর ধুরন্ধর পুঁজিপতিরা, মালিকরা মনে মনে ভাবছে যে, দেশের বামপন্থী, সমাজবাদী, বিপ্লবী, কমিউনিস্ট নেতাদের এমন এক আফিং খাইয়েছি যে আর দেখতে হবে না। কীসের আফিং? জাতীয়তাবাদের আফিং। তারা বোঝাচ্ছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই জাতীয় স্বার্থ, দেশের মঙ্গল, দেশের ঐক্য-শৃঙ্খলা রক্ষা করা তোমাদের কাজ। সুতরাং শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা চলে না, শান্তি নষ্ট করা চলে না, আইন অমান্য করা চলে না, তাতে দেশের বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসা হবে। মালিকরা এসব বোঝাচ্ছে, আর সব বিপ্লবীরা, সমাজতন্ত্রীরা, কমিউনিস্টরা বসে বসে মাথা নাড়াচ্ছে। অথচ বিষয়টা ঠিক উল্টো। দেশের এইসব নেতাদের জাতীয়তাবাদ আর প্রগতির আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারলে, তাদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হলে, দেশের বিপর্যয় রুখবে কে? তখন বিপদ ঘাড়ের ওপর হুড়মুড় করে এসে পড়তে বাধ্য। ফ্যাসিবাদ আসবে দেশের নাম করে। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে, 'দেশের স্বার্থের' দিকে লক্ষ রেখে। মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হবে, 'দেশের স্বার্থ' রক্ষা করার জন্য। চাষী আন্দোলনকে উচ্ছৃঙ্খলতা বলে আখ্যা দেওয়া হবে, 'দেশের স্বার্থে'র জন্য; আর বামপন্থী, সমাজবাদীরা সেগুলো বসে বসে হজম করবে। বড়জোর পার্লামেন্ট, অ্যাসেম্বলিতে বসে একটু প্রতিবাদ করবে আর মাইনে নেবে, ফার্স্ট ক্লাসে ঘুরে বেড়াবে, আর পার্কে এসে বক্তৃতা করবে। এই হচ্ছে আজ বামপন্থী আন্দোলনের চেহারা। বীরভূমে পুলিশ রাত্রে ঘরে ঘরে ঢুকে মেয়েদের রেপ করল — এমনকী ব্যাটন ঢুকিয়ে দিল। এক অমানুষিক, দানবীয় অত্যাচার করল। এসব ঘটনার প্রমাণ দিয়ে, ডকুমেন্ট দিয়ে তুলে ধরার পরও সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, সোস্যালিস্টরা কেউ প্রতিবাদ করেনি। সব চুপ করে রইল, কিছু করল না। বরং তালে তালে বলতে শুরু করল — পুলিশ ঠিক করেছে। পুলিশ কি উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করতে পারে? ওরা ধান লুঠ করেছে, জোতদারদের মারতে গেছে। এ তো উচ্ছৃঙ্খলতা, বেআইনি কাজ! পুলিশের কাজ দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। পুলিশ ঠিকই করেছে। এরা বক্তৃতা করেছে পুলিশের সমর্থনে। আর কংগ্রেসিরা বলতে শুরু করল — তাতো বটেই। ওরা যদি ধান লুঠ করে থাকে, আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে থাকে তবে তো পুলিশ কিছু অন্যায় করেনি। এই হচ্ছে পরিস্থিতি।

এসব থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় এটাই যে, দুর্যোগ ঘাড়ের ওপর এসে গেছে। সে দুর্যোগ হচ্ছে, একেবারে নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী শাসনের দুর্যোগ। দেশে যাতে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে, সেজন্য গোটা দেশে পুরোপুরি স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা কায়েম করার চক্রান্ত চলেছে। তাই যেখানেই গণআন্দোলন এতটুকু মাথা চাড়া দিচ্ছে তাকে বেদম প্রহার করে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হচ্ছে। জওহরলাল জোর গলায় বলছেন, কোনও রকম হল্লাগুল্লা, বেআইনি কাজ বরদাস্ত করা হবে না। এসব করলেই পিটিয়ে মারা হবে। গণতন্ত্রের মুখোসের আড়ালে, পার্লামেন্টের বক্তৃতাবাজির আড়ালে ঠিক ঝানু ডিকটেটরের মতো কথা বলছেন, আর স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চালু করতে চলেছেন। আর বামপন্থীরা, সোস্যালিস্টরা, কমিউনিস্টরা এসব বসে বসে দেখছেন। যাঁরা মুখে বিপ্লবের বাগাড়ম্বর করেন, তাঁরা সকলেই বসে বসে দেখছেন। কোনও কার্যকরী প্রতিবাদ করছেন না। কিন্তু কেন?

একটা কথা আপনাদের বুঝতে হবে যে, এরা কেউ-ই বিপ্লবী নয়। এদেশে আমরা ছাড়া বিপ্লবী কেউ নেই। তাই আমাদেরই সব দায়। আমরা না পারি এদের সঙ্গে সুর মেলাতে, না পারি আজ একক শক্তিতে কার্যকর প্রতিবাদ গড়ে তুলতে। যাকে সত্যিকারের প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা বোঝায়, আজ আমরা তা করতে পারছি না। কাজেই আমরা ছটফট করছি। কিন্তু শুধু ছটফট করে কী হবে? ছটফট করতে করতে হয়তো একদিন আমরা শেষ হয়ে যাব। তাতে কিছু লাভ হবে না। কাজেই বলছিলাম যে, এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের উপযুক্ত শক্তি অর্জন করতে হবে। আমাদের পার্টি এস ইউ সি আই এবং কে কে এম এফ সহ পার্টির অন্যান্য গণসংগঠন সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তৈরি হওয়ার জন্য যা যা করা দরকার, দেখা দরকার, সেইভাবে আমাদের তৈরি হতে হবে, শিখতে হবে। এই মুহূর্তে এগুলোই হচ্ছে কাজের কথা, এই কাজগুলোই আসল কাজ। এছাড়া জাতীয় সমস্যা, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, তার বিভিন্ন সমস্যা এবং প্রশ্ন, সেগুলো আলোচনা করতে হবে,

জানতে হবে। সমস্ত সমস্যারই উত্তর আমাদের দিতে হবে। তার কোনও কার্পণ্য হবে না। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা, রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরগুলো, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আমাদের নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু যেটা চাই, সেটা হল শুধু নিষ্ফলা জ্ঞান নিয়ে ফিরে যাওয়া নয়। জ্ঞানটাকে যাতে কাজে রূপ দেওয়া যায়, বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়, সেটাই ভাল করে দেখতে হবে। তার জন্য চাই সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাকে প্রয়োগ করার মন এবং নিরলস প্রচেষ্টা, আর জীবনভর সাধনা। সুতরাং কর্মীদের কাছে আমার আবেদন, আপনারা এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন, মূল সমস্যাকে সঠিকভাবে বুঝতে শিখুন, নিজেদের দায়িত্ব পালনে উদ্যোগ নিন, বর্তমান অসহনীয় পরিস্থিতির হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে বাস্তব পথ, সে কাজে অগ্রণী হোন। নেতাদের উদ্দেশে আমি আবার বলছি, স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গি, যা সংগঠনের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ, সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংগঠনকে দাঁড় করান। প্রতিটি জেলায় সংগঠনকে ছড়িয়ে দিন। ঢিলেঢালা মনোভাব ঝেড়ে ফেলে, শুধু হাততালি না নিয়ে, পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে এগিয়ে আসুন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাই আমাদের প্রধান কর্তব্য বলে আমি মনে করি। এইভাবে যদি সকলে মিলে এগোতে পারেন তবেই আমি মনে করব এই সম্মেলন সার্থক। একথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

পশ্চিমবঙ্গ কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের
দশম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে ১৯৬০ সালের
১৮ জুন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার
ভাটপাড়ায় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৮২ সালের ২৩ অক্টোবর পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়।